বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

ইউনিট
৮

প্রাচীনকাল থেকে ভারতীয় উপমহাদেশ-বিশেষ করে বাংলা অঞ্চল ছিল ধন সম্পদে পূর্ণ রূপকথার মতো একটি দেশ। এ অঞ্চলের স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রাম অর্থাৎ মানুষের জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবকিছুই তখন এসব গ্রামগুলোতে পাওয়া যেত। এই স্বয়ং-সম্পূর্ণ গ্রামের কৃষকদের ক্ষেত ভরা ফসল, গোলা ভরা ধান, পুকুর ভরা মাছ থাকত। কুটির শিল্পেও এই গ্রামগুলো ছিল সমৃদ্ধ। তাঁতিদের হাতে বোনা কাপড় ইউরোপের কাপড়ের চেয়েও উন্নতমানের ছিল। এর মধ্যে জগৎ বিখ্যাত ছিল মসলিন কাপড়। তাছাড়া উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলও নানা ধরনের বাণিজ্যিক পণ্য, মসলার জন্য বিখ্যাত ছিল। এসব পণ্যের আকর্ষণেই অনেকে এদেশের সঙ্গে বাণিজ্য করতে এসেছে। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিও উপমহাদেশে এসেছিল ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে। পরবর্তী সময়ে তারা এদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করতে সক্ষম হয়। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের আগত অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোকে পরাজিত করে এবং স্থানীয় শাসকদের বিরুদ্ধে নানা মুখী ষড়যন্ত্র করে কীভাবে এ অঞ্চলে ইংরেজ শাসনের সূচনা করে বর্তমান ইউনিটে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। আরো আলোকপাত করা হয়েছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন কীভাবে আনা হয়েছে তার উপর।

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১ ঃ বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন
পাঠ-৮.২ ঃ বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতা দখল
পাঠ-৮.৩ ঃ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

পাঠ-৮.১ বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- বাংলায় ইংরেজ শাসনের পটভূমি বলতে পারবেন;
- পলাশী ও বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি ও ফলাফল সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম, কুটির শিল্প, মসলিন কাপড়, অটোমান তুর্কি, বাণিজ্য কুঠি, ম্যাগনাকার্টা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ভাস্কো-ডা-গামা

বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন: সাত শতক থেকে এ অঞ্চলের সঙ্গে আরব বণিকদের ব্যবসায়-বাণিজ্য ছিল একচেটিয়া। তারা বাণিজ্য করতো মূলত সমুদ্রপথে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটোমান তুর্কিরা দখল করে নেয়। ফলে ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে জলপথে ব্যবসায়-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। প্রাচ্যের সাথে পাশ্চাত্যের ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ভিন্ন জলপথ আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মূলত একারণেই ইউরোপীয় শক্তিগুলো সমুদ্র পথে উপমহাদেশে আসার অভিযান শুরু করে।

পর্তুগীজ

পর্তুগীজদের মধ্যে যে দুঃসাহসী নাবিক প্রথম সমুদ্রপথে ভারতের পশ্চিম-উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন, তিনি ভাস্কো-ডা-গামা। ১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৭ মে তার এ উপমহাদেশে আগমন ব্যবসায়-বাণিজ্য এবং যোগাযোগ ক্ষেত্রে এক নতুন যুগের সূচনা করে। পর্তুগিজরা ব্যবসায়-বাণিজ্যকে মূলধন করে এদেশে এলেও ক্রমে ক্রমে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়ে। স্বল্প সময়ের মধ্যে তারা কালিকট, চৌল, বোম্বাই, সালসেটি, বেসিন, কোচিন, গোয়া, দমন, দিউ প্রভৃতি অঞ্চলে কুঠি স্থাপন এবং ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম ও সাতগাঁওয়ে শুল্কঘাটি নির্মাণের অনুমতি লাভ করে। উড়িষ্যা ও বাংলার কিছু অঞ্চলেও তারা বসতি সম্প্রসারিত করতে সক্ষম হয়। প্রথম আগত ইউরোপীয়ান বাণিজ্যিক দল হলেও তাদের অপকর্ম ও দস্যুতার কারণে বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খান পর্তুগিজদের চট্টগ্রাম ও সন্দ্বীপের ঘাঁটি দখল করে, তাদের বাংলা থেকে বিতাড়িত করেন। তাছাড়া পর্তুগিজরা এদেশে আগত ইউরোপীয় অন্যন্য শক্তির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরাজিত হয়ে এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজ ও দিনেমার

হল্যান্ডের অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়। তারা 'ডাচ ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে বাণিজ্যের উদ্দেশে ১৬০২ খ্রিস্টাব্দে উপমহাদেশে আসে। তারা কালিকট, নাগাপট্টম, বাংলার চুঁচুড়া, বাকুড়া, বলাসোর, কাশিমবাজার এবং বরানগরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু অপর ইউরোপীয় শক্তি ইংরেজদের সঙ্গে তাদের ব্যবসায়-বাণিজ্য নিয়ে বিরোধ শুরু হয় এবং একই সঙ্গে তারা বাংলার শাসকদের সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। ১৭৫৯ খ্রিস্টাব্দে ওলন্দাজরা বিদরার যুদ্ধে ইংরেজদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ফলে ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে শেষ পর্যন্ত সকল বাণিজ্যকেন্দ্র গুটিয়ে তারা এদেশ ত্যাগে বাধ্য হয়।

ওলন্দাজদের মতোই দিনেমার বা ডেনমার্কের অধিবাসী একদল বণিক বাণিজ্য করার জন্য 'ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে। ১৬২০ খ্রিস্টাব্দে তারা দক্ষিণ ভারতের ত্রিবাঙ্কুর এবং ১৬৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার শ্রীরামপুরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। কিন্তু এদেশে লাভজনক ব্যবসা করতে ব্যর্থ হয়ে ১৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে বাণিজ্যিক সফলতা ছাড়াই দিনেমাররা এদেশ ত্যাগ করে।

ইংরেজ

প্রাচ্যের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য অন্যান্য ইউরোপীয় বণিকদের মতো ইংরেজ বণিকদেরকেও এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহিত করে; ইংল্যান্ডের একদল বণিক 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' নামে একটি বণিক সংঘ গঠন করে। এই সংঘটি ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে রাণী এলিজাবেথের কাছ থেকে ১৫ বছর মেয়াদি একচেটিয়া বাণিজ্য করার সনদপত্র লাভ করে। প্রাচ্যে বাণিজ্য করার সনদপত্রটি নিয়ে বাণিজ্যিক সুবিধা পাবার আশায় প্রথমে সম্রাট আকবর এবং পরে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে এসে উপস্থিত হয়। জাহাঙ্গীরের অনুমতি লাভ করে ১৬১২ খ্রিস্টাব্দে কোম্পানি সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। স্বল্প সময়ের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সুরাট, আগ্রা, আহমদাবাদ, মসলিপট্টমে বাণিজ্যকুঠি স্থাপন করে এদেশে তাদের ভিত্তি মজবুত করে ফেলে। এরপর তারা বাংলার বালাসোরে বাণিজ্য কুঠি এবং করমন্ডল (মাদ্রাজ) উপকূলে একটি দুর্গ নির্মাণ করতে সক্ষম হয়। বাংলার সুবেদার শাহ সুজার অনুমতি নিয়ে ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে হুগলিতে একটি বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কাশিমবাজার, ঢাকা, মালদহেও তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের যৌতুক হিসেবে লাভ করা বোম্বাই শহরটিও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি পঞ্চাশ হাজার পাউন্ডে কিনে নেয়। পরবর্তিকালে এই বোম্বাই শহরই কোম্পানির প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়।

১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে আরেক জন ইংরেজ জব চার্ণক ১২০০ টাকার বিনিময়ে কোলকাতা, সুতানটি ও গোবিন্দপুর নামে তিনটি গ্রামের জমিদারী স্বত্ত্ব লাভ করে। ভাগীরথী নদীর তীরের এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করেই পরবর্তিকালে কোলকাতা নগরীর জন্ম হয়। এখানেই কোম্পানি ১৭০০ খ্রিস্টাব্দে ইংল্যন্ডের রাজা তৃতীয় উইলিয়মের নাম অনুসারে নির্মাণ করে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। ধীরে ধীরে এটি ইংরেজদের বাণিজ্যিক স্বার্থ রক্ষা এবং রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি পায় যখন দিল্লীর সম্রাট ফারুখশিয়ার তাদের বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের অধিকার প্রদান করেন। এই সঙ্গে নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের অধিকারও তারা লাভ করে। সম্রাটের এই ফরমানকে ইংরেজ ঐতিহাসিক ওরমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মহাসনদ বা ম্যাগনা-কার্টা বলে উল্লেখ করেন। এই অধিকার লাভ করে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি অপ্রতিরুধ্য গতিতে অগ্রসর হতে থাকে।

ফরাসি

ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উপমহাদেশে আগত সর্বশেষ ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি। ১৬৬৪ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাণিজ্যিক কোম্পানিটি সর্বপ্রথম সুরাটে ১৬৬৮ খ্রিস্টাব্দে এবং পরের বছর মুসলিপট্টমে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এছাড়া ১৬৭৩ খ্রিস্টাব্দে পন্ডিচেরীতে গড়ে তোলে ফরাসি উপনিবেশ।

১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ফরাসিরা তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম বাংলায় সম্প্রসারিত করে। বাংলার সুবাদার শায়েস্তা খানের কাছ থেকে কোম্পানি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত চন্দননগর নামক স্থানটি কিনে নেয়। কয়েক বছরের মধ্যে চন্দননগর একটি শক্তিশালী সুরক্ষিত ফরাসি বাণিজ্য কুঠিতে পরিণত হয়। ১৬৯৬ খ্রিস্টাব্দে এই অঞ্চলে একটি শক্তিশালী দুর্গ প্রতিষ্ঠা করা হয়। তাছাড়া এর আগেই ফরাসি কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় নির্দিষ্ট হারে শুল্ক প্রদানের শর্তে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। পরবর্তিকালে তারা কাশিমবাজার ও বালাসোরে কুঠি স্থাপন করতে সক্ষম হয়।

ফরাসি বণিকরা যখন এদেশে বাণিজ্য করতে আসে ইংরেজ বণিকরা তখন ব্যবসায় বাণিজ্যে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। এ অবস্থায় ফরাসিদের ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। কারণ ইংরেজদের মতো ফরাসিরাও এ দেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে থাকে। ফলে এই দুই ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে সংঘাত সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজদের ষড়যন্ত্র, কূটকৌশল, উন্নত রণ কৌশলের কাছে শেষ পর্যন্ত ফরাসিরা পরাজিত হয়। তাছাড়া বাংলার নবাবের পক্ষ অবলম্বন করায় এবং ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজদের সাফল্য তাদেরকে আরও পর্যুদস্ত করে ফেলে। স্বাভাবিকভাবে বাংলায় অবস্থিত ফরাসি কুঠিগুলো ইংরেজদের দখলে চলে যায়। দাক্ষিণাত্যের কর্ণাটকের যুদ্ধসমূহে ফরাসি কোম্পানির পরাজয় তাদের এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। প্রথমে পর্তুগীজ পরে ওলন্দাজ শক্তির পতন, সর্বশেষে ফরাসিদের পরাজয় ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থানের পথ সুগম হয় এবং এ অঞ্চলে তারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়। একশ বছর অর্থাৎ ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত এদেশে কোম্পানির শাসন চলে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• উপমহাদেশে পর্তুগিজদের স্থাপিত বাণিজ্য কুঠিগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করুন। • যে তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে কোলকাতার জন্ম তার একটি তালিকা তৈরী করুন।

সারসংক্ষেপ

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্টান্টিনপোল অটমান তুর্কিদের দখলে চলে গেলে, উপমহাদেশের সঙ্গে ইউরোপীয়দের সমুদ্র পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ভারতবর্ষে আসার ভিন্ন পথ আবিষ্কারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই পথ আবিষ্কারে প্রথম সফল হন পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা। সর্ব প্রথম পর্তুগিজরাই ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য আসে। তাদের পথে আসে হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ইংরেজ এবং ফরাসিরা। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বে, প্রতিযোগিতায় শেষ পর্যন্ত টিকে যায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানি স্বল্প সময়ের মধ্যে স্থানীয় শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রথমে বাংলা পরে সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে নেয়। একশ বছর অর্থাৎ ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত চলে এদেশে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন এবং চরম শোষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ওলন্দাজরা কোন দেশের অধিবাসী–
   ক) ইংল্যান্ড   খ) হল্যান্ড   গ) নিউজিল্যান্ড   ঘ) আইসল্যান্ড

২। ইউরোপ থেকে ভারত আসার জলপথ আবিষ্কার করেন কে?
   ক) কলম্বাস   খ) বার্থালোমা দিউজ   গ) ভাস্কো-ডা-গামা   ঘ) আমিরিগো ভেসপুচি

৩। ইউরোপীয়দের ভারত আগমনের উদ্দেশ্য কী ছিল?
   ক) ধর্মীয়   খ) রাজনৈতিক   গ) বাণিজ্যিক   ঘ) সাংস্কৃতিক

৪। উপমহাদেশের শাসকবর্গের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে রাজ্য দখলে আগ্রহী হয়ে উঠে–
   i) ইংরেজ কোম্পানি   ii) ফরাসি কোম্পানি   iii) স্পেনীশ কোম্পানি

   নিচের কোনটি সঠিক?
   ক) i ও ii   খ) i ও iii   গ) ii ও iii   ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৮.২ বাংলায় ইংরেজ ক্ষমতা দখল

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- পলাশী যুদ্ধের কারণ ফলাফল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- নবাবের পতনের কারণগুলো বর্ণনা করতে পারবেন;
- বক্সারের যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন;
- ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ক্ষমতা দখলের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	পলাশীযুদ্ধ, আলীবর্দী খান, ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ, আলীনগর সন্ধি, রবার্ট ক্লাইভ, সিন ফ্রে

পলাশী যুদ্ধের কারণ

১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলার নবাব আলীবর্দী খানের মৃত্যু হলে তার প্রিয় দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন। এসময় তাকে নানামুখি ষড়যন্ত্র ও সমস্যার মোকাবেলা করতে হয়। এর মধ্যে একটি পরিবারিক ষড়যন্ত্র। যা নবাব কৌশলে দমন করতে সক্ষম হন। কিন্তু পরিবারের বাইরেও ষড়যন্ত্রের আরেক জাল বিস্তৃত হতে থাকে। এর সঙ্গে জড়িত হয় দেশি-বিদেশি বণিক শ্রেণি, নবাবের দরবারের প্রভাবশালী রাজন্যবর্গ ও অভিজাত শ্রেণি, নবাবের সেনাপতি মীর জাফরসহ আরো অনেকে। এই ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের পটভূমি তৈরি করতে থাকে। নিম্নে পলাশী যুদ্ধের কারণ বর্ণনা করা হলো–

নবাব সিরাজউদ্দৌলা

- প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজরা সিরাজউদ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে বসার পর নতুন নবাবকে কোনো উপঢৌকন পাঠায়নি এবং কোন সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎ করেনি। ইংরেজদের এই ব্যবহারে নবাব ক্ষুব্ধ হন।
- নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তারা কোলকাতায় দুর্গ নির্মাণ অব্যাহত রাখে।
- ইংরেজরা বাণিজ্যিক শর্ত ভঙ্গ করে নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করে দস্তকের (অনুমতি) অপব্যবহার করে।
- আলীবর্দী খানের সঙ্গে চুক্তির শর্ত ভঙ্গ করে ইংরেজরা নবাবকে কর দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাছাড়া জনগণকে নির্যাতন করার মতো ধৃষ্টতাও তারা দেখাতে থাকে।
- রাজা রাজবল্লভের পুত্র প্রচুর ধন সম্পদ নিয়ে ইংরেজদের কাছে আশ্রয় নেয়। নবাবের দূত তাকে ফেরত চাইতে গলে আপমানিত হন।

ইংরেজ কোম্পানির একের পর এক ধৃষ্টতার জন্য উচিত শিক্ষা দিতে নবাব কোলকাতা ও ইংরেজদের কাশিমবাজার কুঠি দখল করে নেয়। নবাব অতর্কিতে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ আক্রমণ করলে ইংরেজরা ভয়ে দুর্গ ত্যাগ করে। কিন্তু এ সময় একটি ছোট ঘরের মধ্যে বন্দি অবস্থায় শাসরুদ্ধ হয়ে ১২৩ জনের মতো ইংরেজের মৃত্যুর গুজব মাদ্রাজ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়লে সেখান থেকে রবার্ট ক্লাইভ ও ওয়াটসন সসৈন্যে উপস্থিত হয়ে কোলকাতা পুনরায় দখল করে। এ সময়ে নবাব তাঁর চারিদিকে ষড়যন্ত্রের আভাস পেয়ে এক অপমানজনক সন্ধি করতে বাধ্য হন। যে সন্ধিকে বলা হয় আলীনগর সন্ধি।

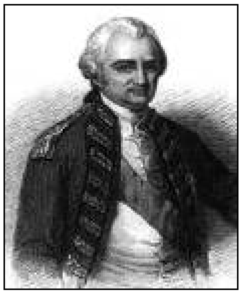

রবার্ট ক্লাইভ

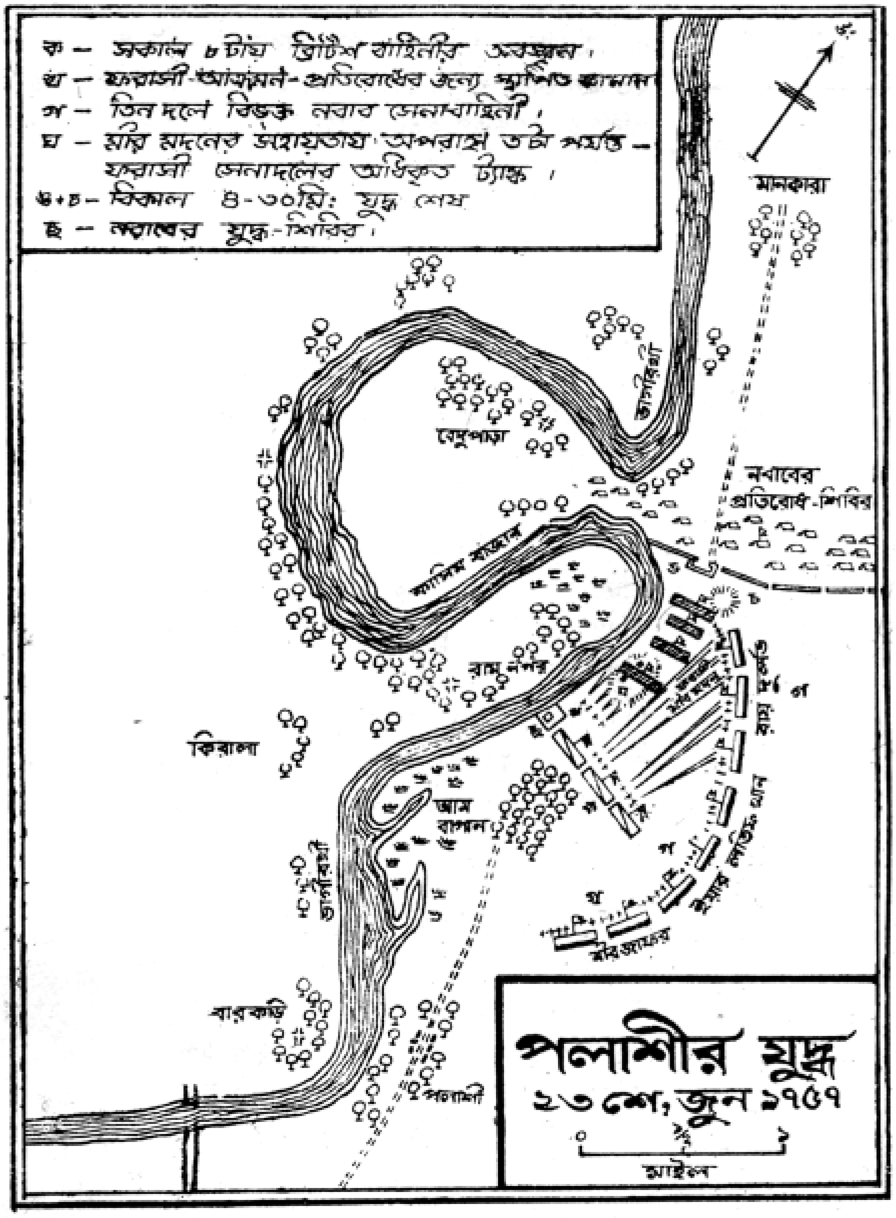

পলাশীর যুদ্ধ ক্ষেত্র

নবাবের পতনের কারণ

রবার্ট ক্লাইভ আলীনগর সন্ধি নবাবের দুর্বলতার প্রকাশ বলে ধরে নেয়। ফলে নবাবকে ক্ষমতাচ্যুত করার এক গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হয় ব্যবসায়ী ধনকুবের জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লব, নবাবের সেনাপতি মীরজাফর প্রমুখ। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে ২৩ জুন ভাগীরথী নদীর তীরে পলাশীর আমবাগানে নবাবের সঙ্গে ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ছিলেন দেশপ্রেমিক মীরমদন, মোহন লাল এবং ফরাসি সেনাপতি সিন ফ্রে। জেতার সবধরণের সুযোগ সুবিধা এবং এদের প্রাণপাত লড়াইয়ের পরও নবাব পরাজিত হন তার সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে। এ যুদ্ধ পলাশীর যুদ্ধ নামে খ্যাত। যুদ্ধে নবাবের পরাজয়ের কারণগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- নবাবের সেনাপতি মীরজাফরের অসহযোগিতা ও বিশ্বাসঘাতকতা।
- নবাবের সেনাপতি, সভাসদসহ প্রত্যেকে দেশের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে নিজ নিজ স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন।
- তরুণ নবাবের অভিজ্ঞতা, দূরদর্শিতা, দৃঢ়তার অভাব ছিল। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হয়েছেন।

- সেনাপতি মীরজাফরের ষড়যন্ত্রের কথা জানা সত্ত্বেও তিনি বার বার তার উপর নির্ভর করেছেন।
- ইংরেজদের সম্পর্কে আলীবর্দী খানের উপদেশ, সতর্কবাণী সিরাজউদ্দৌলার কাছে গুরুত্ব পায়নি।
- নবাবের শত্রু পক্ষ ছিল ঐক্যবদ্ধ এবং তাদের রণকৌশল ছিল উন্নততর।
- রবার্ট ক্লাইভ ছিল দূরদর্শী, সূক্ষ্ম ও কূট বুদ্ধিসম্পন্ন।

পলাশী যুদ্ধের ফলাফল

- সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ও মৃত্যু বাংলায় প্রত্যক্ষ ঔপনিবেশিক শাসনের পথ সুগম করে।
- যুদ্ধের ফলে মীরজাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসালেও প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রবার্ট ক্লাইভের হাতে।
- পলাশী যুদ্ধের ফলে ইংরেজ বা বাংলায় একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ পায়। অপরদিকে ফরাসিরা এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়।
- এ যুদ্ধের পর ইংরেজ শক্তির স্বার্থে এদেশের আর্থ সামাজিক রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হতে থাকে।
- পলাশী যুদ্ধের সুদূর প্রসারী পরিণতি ছিল সমগ্র উপমহাদেশে কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠা। এ ভাবেই এ যুদ্ধে বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা ভূলুণ্ঠিত হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পলাশীর যুদ্ধ একটি খন্ডযুদ্ধ হলেও বাংলা তথা উপমহাদেশের রাজনীতিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম ও সুদূর প্রসারী।

বক্সারের যুদ্ধের কারণ

মীর জাফর

পলাশী যুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক কোম্পানি মীর জাফরকে বাংলার সিংহাসনে বসায়। কিন্তু যে উদ্দেশে মীর জাফরকে সিংহাসনে বসানো হয়েছিল কোম্পানির সে উদ্দেশ্য সফল হয়নি। নতুন নবাব কোম্পানির চাহিদা মতো অর্থ দিতে ব্যর্থ হয়। অপর দিকে রাজকার্যে ক্লাইভের ঘন ঘন হস্তক্ষেপ, নবাবের পছন্দ ছিল না। ফলে নবাব ইংরেজদের বিতাড়নের জন্য গোপনে ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাত করেন। বিষয়টি ইংরেজদের দৃষ্টি এড়ায়নি। ফলে তারা নতুন নবাবের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের অক্ষমতা, ওলন্দাজদের সঙ্গে আঁতাত এবং অযোগ্যতার অভিযোগ তোলে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে ইংরেজ গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ১৭৬০ খ্রিস্টাব্দে মীর জাফরকে ক্ষমতাচ্যুত করে মীর কাশিমকে শর্ত সাপেক্ষে সিংহাসনে বসান। কিন্তু মীর কাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা মানুষ। তিনি চেয়ে ছিলেন ইংরেজদের সঙ্গে সম্মানজনক উপায়ে বাংলার স্বার্থ রক্ষা করে আর্থিক ও সামরিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। এ উদ্দেশ্যে তাঁর গৃহীত পদক্ষেপ গুলোই শেষ পর্যন্ত বক্সারের যুদ্ধের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- মীর কাশিম ইংরেজদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ এবং প্রশাসনকে প্রভাবমুক্ত করার উদ্দেশে রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তরিত করেন। নিরাপত্তার জন্য দুর্গ নির্মাণ করেন এবং রাজধানী চারদিকে পরিখা খনন করেন।
- ইংরেজদের সম্ভাব্য আক্রমণ প্রতিহত করা এবং সৈনিকদের ইউরোপীয় সামরিক পদ্ধতি শিক্ষাদানের জন্য দুজন ইউরোপীয় সৈনিককে প্রশিক্ষক হিসেবে রাখেন।
- অস্ত্র গোলাবারুদের জন্য যাতে কারো উপর নির্ভর করতে না হয় সেজন্য রাজধানীতে কামান, বন্দুক ইত্যাদি তৈরির ব্যবস্থা করেন।
- বিহারের শাসনকর্তা রাম নারায়ণ ইংরেজদের প্রতি বেশি আগ্রহ দেখালে তাকে পদচ্যুত ও তার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়।
- ১৭১৭ খ্রিস্টাব্দে মুঘল সম্রাটের ফরমানে ইংরেজদের ব্যবসায় করার যে সুযোগ-সুবিধা দেয়া হয়েছিল তারা তার অপব্যবহার করা শুরু করে। দস্তক নামের ছাড়পত্রের অপব্যবহারের ফলে দেশি ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে থাকে। ফলে, নবাব সবার জন্য এক ব্যবস্থা গ্রহণ করে দেশের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে দেশীয় বণিকদের জন্যও সবধরণের শুল্ক উঠিয়ে দেন। ফলে ইংরেজ কোম্পানির কর্মচারীদের একচেটিয়া লাভজনক ব্যবসায় অসুবিধা হয়। এ বিষয়ে নবাব কোনোরকম আপোষ করতে না চাইলে ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাত অনিবার্য হয়ে পড়ে।
- নবাবের সকল পদক্ষেপ ছিল দেশ ও জনগণের স্বার্থে, কিন্তু ইংরেজ স্বার্থবিরোধী। ফলে ক্ষুব্ধ ইংরেজরা এর প্রতিকারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

বক্সারের যুদ্ধের প্রত্যক্ষ কারণ

নবাবের ইংরেজ স্বার্থ বিরোধী কার্যক্রমে ক্ষুব্ধ হয়ে পাটনা কুঠিরের অধ্যক্ষ এলিস ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে পাটনা দখল করে নেয়। ফলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ছাড়া নবাবের আর কোনো উপায় থাকে না। মীর কাশিম সফল প্রতিরোধের মাধ্যমে এলিসকে পাটনা থেকে বিতাড়িত করেন। ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতা কাউন্সিল নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। মেজর এডামসের নেতৃত্বে প্রেরিত ইংরেজ বাহিনীর কাছে গিরিয়া, কাটোয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে নবাব শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। ইতোমধ্যে ইংরেজরা মীর জাফরকে আবার বাংলার সিংহাসনে বসায়। মীর কাশিম পরাজিত হয়েও হতাশ হননি। নবাব ইংরেজদের মোকাবেলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকেন। তিনি অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একত্রিত হয়ে ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বিহারের বক্সার নামক স্থানে ইংরেজদের বিরুদ্ধ যুদ্ধে লিপ্ত হন যা ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ নামে খ্যাত। দুর্ভাগ্যক্রমে সম্মিলিত বাহিনী, মেজর মনরোর কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়। মীর কাশিমের পরাজয়ের কারণে বাংলার সার্বভৌমত্ব উদ্ধারের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। ইংরেজ শক্তি অপ্রতিরুধ্য গতিতে বাংলা তথা উপমহাদেশের সর্বত্র ক্ষমতার বিস্তার ঘটাতে থাকে। এ কারণে উপমহাদেশের ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধের চেয়ে বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব অনেক বেশি।

বক্সারের যুদ্ধের ফলাফল

বক্সারের যুদ্ধ উপমহাদেশের ইতিহাসে একটি সুদূর প্রসারী তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এই যুদ্ধের ফলাফল নিম্নে উল্লেখ করা হলো–

- এ যুদ্ধের ফলে মীর কাশিমের স্বাধীনতা রক্ষার শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হয়। উপমহাদেশে ইংরেজদের প্রভাব প্রতিপত্তি মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। বিনা বাধায় তারা উপমহাদেশে আধিপত্য বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।
- এ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা রোহিলাখন্ডে পালিয়ে যান। দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম ইংরেজদের পক্ষে যোগ দেন। মীর কাশিম পরাজিত হয়ে আত্মগোপন করেন।
- ইংরজরা অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে কারা এলাহাবাদ হস্তগত করতে সক্ষম হয়।
- এ যুদ্ধের ফলে শুধু বাংলার নবাবই পরাজিত হননি, তাঁর মিত্র ভারত সম্রাট শাহ আলম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা পরাজিত হন। এই তিন শক্তির একসঙ্গে পরাজয়ের কারণে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়।
- এ যুদ্ধের ফলে রবার্ট ক্লাইভ দিল্লি সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করে। ফলে বাংলায় ইংরেজ অধিকার আইনত স্বীকৃত হয় এবং তারা অসীম ক্ষমতাশালী হয়ে উঠতে থাকে।

বক্সারের যুদ্ধ মীর কাশিমের শাসন এবং নবাবী আমলেরই শুধু পরিসমাপ্তি ঘটায়নি, মুঘল সম্রাটের দুর্বলতাও ইংরেজদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। ফলে ঔপনিবেশিক শক্তি হিসেবে দ্রুতগতিতে ইংরেজদের আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	• পলাশীযুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী এবং তার পক্ষে অবস্থানকারীদের একটি চার্ট তৈরি করতে হবে। • বক্সারের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের নাম ও তাদের দেশের নাম পাশাপাশি রেখে একটি ছক প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের কারণে বাংলায় ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। তবে পলাশীর বিজয়ে কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা হয়নি। সে জন্য তাকে আরো একটি যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। মীর জাফর ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষা করতে ব্যর্থ হলে তাকে সরিয়ে মীর কাশিমকে সিংহাসনে শর্তসাপেক্ষে বসানো হয়। স্বাধীনচেতা মীর কাশিম ইংরেজদের অনুগত না হয়ে স্বাধীনভাবে দেশ পরিচালনার জন্য একের পর এক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যার ফলে শেষ পর্যন্ত ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এই যুদ্ধে বাংলার নবাব একা পরাজিত হননি তাঁর সাথে তার মিত্র দিল্লির সম্রাট শাহ আলম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলাও পরাজিত হন। এই তিন শক্তির এক সঙ্গে পরাজয়ের কারণে ইংরেজদের মর্যাদা ও শক্তি বৃদ্ধি পায়। একই সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের পথ সুনিশ্চিত হয়। যার পরিণতিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একশবছর অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই উপমহাদেশ শাসন করতে সক্ষম হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। পলাশীযুদ্ধ কবে সংঘটিত হয়?

ক) ১৭৫৬, ১৩ জুন খ) ১৭৫৭, ২৩ জুন
গ) ১৭৬৪, ১২ জুন ঘ) ১৭৬৩, ৩০ জুন

২। পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের ফলে ভারতে–

ক) বাংলার স্বাধীন নবাবি শাসনের অবসান হয় খ) বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়
গ) মুঘল সম্রাটদের ক্ষমতা সুসংহত হয় ঘ) ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের পথ প্রশস্ত হয়

৩। পলাশীর যুদ্ধে নবাবের পক্ষে প্রাণপণ যুদ্ধ পরিচালনা করেন– (অনুধাবন)

i) মীর জাফর ii) মীর মদন iii) মোহন লাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চিত্রটি পর্যবেক্ষণ করে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

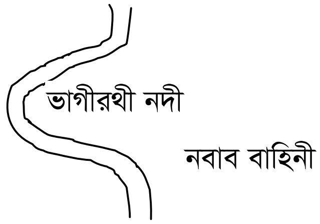

৪। উপরের চিত্রটি কোন যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত?

ক) পলাশীর যুদ্ধ খ) বক্সারের যুদ্ধ
গ) গিরিয়ার যুদ্ধ ঘ) ইঙ্গ মহীশুর যুদ্ধ

৫। উক্ত যুদ্ধে ইংরেজরা জয়ী হয়

i) ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ii) বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে iii) অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii
গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

সৃজনশীল

৬। ‘ক’ নামের একটি দেশের সম্পদে আকৃষ্ট হয়ে বিভিন্ন দেশ থেকে জাতি গোষ্ঠী আসতে থাকে। একপর্যায়ে ক দেশের সাথে আগত খ দলের যুদ্ধ হয়। ক দলের সৈন্য রসদ বেশি থাকলেও তাদের দুই জন সেনাপতি রোবটরূপী সেনা মোতায়েন করে যাদের মেমোরিতে যুদ্ধ না করার কমান্ড থাকায় তারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকে। ফলশ্রুতিতে ক দলের দুঃখজনক পরাজয় ঘটে ও স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হয়।

ক. সিরাজউদ্দৌলা কবে বাংলার মসনদে আরোহন করেন?
খ. ষোড়শ শতকে অনেক ইউরোপীয় জাতি বাংলায় এসেছিল কেন?
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধটি পাঠ্য বইয়ের যে যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি সে যুদ্ধের মূল কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. “উক্ত যুদ্ধই বাংলার স্বাধীনতা সূর্যকে দুইশত বছরের জন্য ছিনিয়ে নেয়”– মতামত দিন।

পাঠ-৮.৩ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- ১৭৯৩ সালে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কী তা বর্ণনা করতে পারবেন;
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলাফল সম্পর্কে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	এক সালা বন্দোবস্ত, পাঁচ সালা বন্দোবস্ত, দশ সালা বন্দোবস্ত, জমিদার, অনুপস্থিত জমিদার, প্রজাস্বত্ব আইন, পুঁজি, সূর্যাস্ত আইন

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমি:

লর্ড কর্নওয়ালিসকে কোম্পানির শাসন দুর্নীতিমুক্ত ও সুসংগঠিত করতে ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের গভর্নর জেনারেল ও সেনা প্রধানের দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়। তিনি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ঐ বছর ২২ মার্চ নির্দিষ্ট রাজস্ব পরিশোধের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জমিদারদের নিজ নিজ জমির উপর স্থায়ী মালিকানা দান করে যে ভূমি বন্দোবস্ত চালু করা হয় তাকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলা হয়।

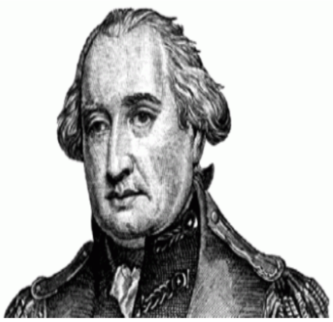
লর্ড কর্নওয়ালিস

ওয়ারেন হেস্টিংস

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের আগে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঁচসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। জমি বন্দোবস্তের নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকায় জমিদাররা অর্থ আদায়ের জন্য কৃষকদের প্রতি চরম নির্যাতন মূলক ব্যবস্থা নিতো। অথচ কৃষকের বা জমির উন্নয়নের প্রতি তাদের কোনো লক্ষ ছিল না। ফলে নির্যাতনের ভয়ে কৃষকরা জমি ছেড়ে পালিয়ে যেতো। বছরের পর বছর জমি অনাবাদিথাকায় জমির দাম কমে যেতে থাকে।এ অবস্থায় হেস্টিংস জমিদারদের সঙ্গে এক সালা বন্দোবস্ত চালু করেন। কিন্তু এ ব্যবস্থায়ও সরকার, জমিদার, প্রজা কারো কোনো ধরনের উপকার হয়নি। ফলে বাংলা, বিহার উড়িষ্যার রাজস্ব সমস্যা সমাধানের জন্য ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট নতুন ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাভাবনা করতে থাকে।এই উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে পিটের ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পার্লামেন্টে গৃহীত হয়। ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষ জমিদারদের সঙ্গে দীর্ঘ মেয়াদি বন্দোবস্তের অনুমতি প্রদান করে। এই অনুমোদনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে কর্নওয়ালিস দশসালা বন্দোবস্ত চালু করেন। একই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, কোম্পানির ডাইরেক্টর সভার অনুমোদন পেলে দশসালা বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে পরিণত হবে। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে বোর্ড অব ডাইরেক্টরস-এর অনুমোদন লাভ করে, কর্নওয়ালিস ১৭৯৩ সালে দশসালা বন্দোবস্তকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলে ঘোষণা করেন।

বৈশিষ্ট্য

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত জমিদারদের জমির স্থায়ী মালিকে পরিণত করে এবং জমিদাররা জমির মালিকানা স্বত্ব লাভ করে।
- রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেয়ার ফলে নিয়মিত রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে জমিদার জমিদারী ভোগের চিরস্থায়ী অধিকার লাভ করে।

- এ প্রথা চালু হওয়ার ফলে জমিদারদের প্রশাসনিক ক্ষমতা বিলুপ্ত হয়। সরকার স্বয়ং শান্তি রক্ষা ও নিরাপত্তার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- নজরানা ও বিক্রয় ফি সমূহ বাতিল করা হয়।
- খাজনা বাকি পড়লে জমিদারদের ভূমির কিছু অংশ বিক্রি করে রাজস্ব আদায় করার ব্যবস্থা ছিল।

ফলাফল

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। কর্নওয়ালিস জমিদার ছিলেন। তিনি ইংল্যান্ডের মতো এদেশেও একটি জমিদার শ্রেণি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইউরোপ আর উপমহাদেশের আর্থ-সামাজিক কাঠামো ও তার বিকাশের ধরণ এক ছিল না। ফলে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেয়া এ ব্যবস্থায় সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই হয়েছিল বেশি।

সুবিধা

- এ ব্যবস্থার প্রধান সুবিধা হচ্ছে সরকারের রাজস্ব আয় সুনির্দিষ্ট হওয়ার ফলে সরকার তার আয়ের পরিমাণ সম্পর্কে নিশ্চিত হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি কোম্পানির একনিষ্ঠ সমর্থক হয়ে উঠে। ফলে ব্রিটিশ শাসন দৃঢ়করণ এবং দীর্ঘায়িতকরণে জমিদাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়।
- জমিদাররা জমির মালিক হওয়ার কারণে উৎসাহিত হয়ে পতিত জমি, জঙ্গলাকীর্ণ জমি চাষের ব্যবস্থা করেন। ফলে উৎপাদন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির রাজস্বের উন্নতি হয়।

অসুবিধা

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদারের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। তারা ধীরে ধীরে ধনিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। কিন্তু অপর দিকে জমিতে প্রজাদের পুরোনো স্বত্ব সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়। ফলে জমিদার ইচ্ছে করলেই যেকোনো সময় তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে পারত। প্রথম দিকে প্রজাস্বত্ব আইন না থাকায় তাদের ভাগ্যের জন্য তারা সম্পূর্ণভাবে জমিদারের দয়ার উপর নির্ভর করতো।

- চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমির সঠিক জরিপের ব্যবস্থা না থাকায় অনেক সময় নিষ্কর জমির উপর বেশি রাজস্ব ধার্য করা হতো। জমির সীমা নির্ধারিত না থাকায় পরবর্তিকালে মামলা বিবাদ দেখা দিতো।
- সূর্যাস্ত আইনে নির্দিষ্ট তারিখে সূর্যাস্তের মধ্যে খাজনা পরিশোধ করার কঠোর নিয়মের কারণে অনেক বড় বড় জমিদারী নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। একমাত্র বর্ধমানের জমিদারী ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সাত বছরের মধ্যে অন্যান্য সব জমিদারী ধ্বংস হয়ে যায়।
- জমিদারি আয় ও স্বত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জমিদাররা নায়েব-গোমস্তার উপর দায়িত্ব দিয়ে শহরে বসবাস শুরু করেন। এইসব অনুপস্থিত জমিদারদের নায়েব-গোমস্তাদের অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। ফলে জমির উৎপাদন কমে যেতে থাকে, গ্রামের অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ হতে থাকে।
- উপমহাদেশে জমির মালিকানা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। ফলে নিম্নবর্ণের অনেক ব্যক্তি, সাধারণ মানুষ যারা কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য করে প্রচুর অর্থের মালিক হন, তারা জমিদারী কিনে আভিজাত্যের মর্যাদালাভে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে দেশীয় পুঁজি, দেশীয় শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা হ্রাস পায়।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষকরা সরাসরি জমিদার কর্তৃক শোষিত হতে থাকে। আবার এই জমিদার শ্রেণির পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে গ্রামীন সমাজে একটি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠছিল, যারা পরবর্তী সময়ে দেশ জাতি সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ কর্তৃক সৃষ্ট জমিদার শ্রেণি যারা প্রথমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শক্ত ভিত ছিল, তাদেরই পরবর্তী প্রজন্ম পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ব্রিটিশ রাজ উৎখাতের জন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

অ্যাকটিভিটি (নিজে করি) **/শিক্ষার্থীর কাজ**	চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমি ও প্রজাদের কী ধরণের ক্ষতি হয়েছিল এবং জমিদারদের কী ধরনের ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল

সারসংক্ষেপ

ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচসালা বন্দোবস্ত এবং একসালা বন্দোবস্ত করে ভূমিব্যবস্থায় পরিবর্তন আনে। তবে এই ব্যবস্থা প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ে ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে কর্নওয়ালিস প্রথমে দশসালা পরে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে একে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। এর মাধ্যমে ইংরেজরা এদেশে তাদের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল হলেও বাংলার সাধারণ কৃষক এমনকি অনেক সম্ভ্রান্ত বনেদি জমিদার সর্বশান্ত হয়ে যায়। নবসৃষ্ট জমিদার শ্রেণি ইংরেজ শাসন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখলেও এদের পরবর্তী প্রজন্ম, সুশিক্ষিত সচেতন শ্রেণি স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরে। এদেশ থেকে ইংরেজদের বিতারণের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা নেতৃত্ব ছিল মুখ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রবর্তক কে?

ক) লর্ড ক্লাইভ　　খ) লর্ড কর্নওয়ালিস
গ) লর্ড রিপন　　ঘ) লর্ড ডালহৌসি

২। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল–

ক) ভূমি সংক্রান্ত বন্দোবস্ত　　খ) বাণিজ্য সংক্রান্ত বন্দোবস্ত
গ) শাসন সংক্রান্ত বন্দোবস্ত　　ঘ) শিল্প সংক্রান্ত বন্দোবস্ত

৩। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে–

i) জমিদারদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়
ii) প্রজাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়
iii) প্রজাদের পুরানো স্বত্ব বিলুপ্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

৪। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কে জমির মালিক হয়েছিল– (জ্ঞানমূলক)

ক) কৃষক　　খ) নবাব
গ) জমিদার　　ঘ) সম্রাট

৫। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি আয় কেমন ছিল (অনুধাবন)

ক) কম　　খ) বেশি
গ) নির্দিষ্ট　　ঘ) অনির্দিষ্ট

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

চাপিতলার প্রজাবৎসল জমিদার কাশেম ভূঁইয়া সর্বদা প্রজার পাশে থাকতেন কিন্তু একদিন নির্দিষ্ট দিনে খাজনা জমা দিতে ব্যর্থ হলে তার জমিদারি নিলামে ওঠে, নিলামে জমিদারি কিনে নেন ব্যবসায়ী শংকর মজুমদার। তিনি প্রজাদের জোর করে হলেও নিয়মিত খাজনা আদায় করতেন।

৬। কাশেম সাহেবের জমিদারি নিলামে ওঠে কোন আইনের বলে–
ক) সূর্যাস্ত আইন খ) ইলবার্ট বিল
গ) রওলাট আইন ঘ) নিয়ামক আইন

৭। কাশেম সাহেব যে আইনের বলে জমিদারি হারান সে আইনের উদ্যোক্ত কে?
ক) ওয়ারেন হেষ্টিংস খ) জন কাটিয়ার
গ) লর্ড কর্নওয়ালিস ঘ) লর্ড ক্লাইভ

সৃজনশীল

হাবীব সাহেব তাঁর মেডিকো নামের ঔষধের দোকানটিতে যতাযথভাবে সময় না দেওয়ায় আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন। তাই তিনি ১টি চুক্তি পত্রের মাধ্যমে ইকবাল সাহেবের নিকট দোকানটি হস্তান্তর করেন। এতে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত হলো। উক্ত চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল প্রতিবছর একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাড়ার অর্থ পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু ইকবাল সাহেব নির্দিষ্ট সময়ে ভাড়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে দোকানটি হাতছাড়া হয়ে যায়। কর্ম হারিয়ে তিনি হন সর্বস্বান্ত।

ক. একসালা বন্দোবস্ত কে প্রবর্তন করেন?
খ. পাঁচসালা বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করুন।
গ. উদ্দীপকের গৃহিত পদক্ষেপ লর্ড কর্ণওয়ালিস প্রবর্তিত কোন ব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ? ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. উক্ত ব্যবস্থায় যে নতুন জমিদার শ্রেণির উদ্ভব ঘটে তারা ইংরেজদের ক্ষমতার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করেছিল – মতামত দিন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ ঃ ১. খ ২. গ ৩. গ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ ঃ ১. খ ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ ঃ ১. খ ২. ক ৩. খ ৪. গ ৫. গ ৬. ক ৭. গ